ড. আতিউর রহমান

বর্ষসেরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যক্তিত্ব-২০১৫

গোলাপ মুনীর

ড. আতিউর রহমান। দেশের স্বনামখ্যাত অর্থনীতিবিদ। নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এই মেধাবী অর্থনীতিবিদ এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। দেশের বিভিন্ন সুপরিচিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল পদে সফল দায়িত্ব পালন শেষে তিনি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দশম গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেন ২০০৯ সালের ১ মে। অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান ড. আতিউর রহমানের এই বড় হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে তার মেধা, আন্তরিক শ্রমসাধনা ও দেশপ্রেম। দেশের গরিব মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তার অর্থনৈতিক ভাবনা-চিন্তা সুবিদিত। অনেকে তাকে 'গরিবের অর্থনীতিবিদ' হিসেবেও অভিহিত করেন। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর এর ডিজিটালাইজেশনে তার অবদান অসমান্তরাল। তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সেবা ও কর্মকাণ্ডকে তিনি নতুন উচ্চতায় তুলে এনেছেন। ফলে তিনি আজ দেশে-বিদেশে সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন একজন প্রযুক্তিপ্রেমী ব্যাংকার-ব্যক্তিত্ব হিসেবেও। তারই দূরদর্শী উদ্যোগ-আয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক আজ আধুনিক সেবাসমৃদ্ধ এক অনন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে যেসব সফল ব্যক্তির নাম আজ সব মহলে পরিচিত, ড. আতিউর রহমানের নামও তাদের সাথে সমভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। মাসিক কমপিউটার জগৎ মনে করে, বাংলাদেশের ব্যাংক খাতকে তথ্যপ্রযুক্তি সেবাসমৃদ্ধ করতে তার অবদান জাতি আগামী দিনেও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তার এই অবদানের প্রতি স্বীকৃতি ও সম্মান জানিয়ে মাসিক কমপিউটার জগৎ ড. আতিউর রহমানকে ২০১৫ সালের 'বর্ষসেরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যক্তিত্ব' ঘোষণা করেছে।

জামালপুরের গর্বের ধন

অনন্য উচ্চতার মেধাবীজন ড. আতিউর রহমানের জন্ম বৃহত্তর ময়মনসিংহের জামালপুর জেলার পূর্বপাড় দিঘলী গ্রামে। এক সময়ের অখ্যাত এই গ্রামটির প্রতিটি মানুষের কাছে ড. আতিউর এখন এক পরম গর্বের ধন। তার জন্ম ১৯৫১ সালে। নিজ গ্রামে পড়াশোনা শুরু করে মেধাবলে তিনি লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছেন দেশ-বিদেশের অনেক নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে বিএ (অনার্স) ও এমএ ডিগ্রি নেয়ার পর কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সালে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৮৩ সালে উন্নয়ন অর্থনীতিতে পিএইচডি লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্থনীতিতে এমএসসি ডিগ্রিও নেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া তিনি কানাডার ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট ফেলোশিপ (১৯৮৯), লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোর্ড ফাউন্ডেশন পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ (১৯৯১-৯২) এবং সিঙ্গাপুরের ইনস্টিটিউট অব সাউথ-ইস্ট এশিয়ান স্টাডিজে ভিজিটিং রিসার্চ ফেলোশিপ পান।

কর্মজীবন

গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার অব্যবহিত পূর্বে অধ্যাপক আতিউর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা করছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ছিলেন। এছাড়া দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের পরিচালক এবং জনতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সমুন্নয়' এবং 'উন্নয়ন সমন্বয়'-এর সভাপতি ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, এশিয়াটিক সোসাইটি ও বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য। তিনি বাংলা একাডেমির একজন ফেলোও। দেশ-বিদেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণা প্রকল্পেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং পরিবেশবান্ধব জনকল্যাণমূলক গ্রিন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শসমূহ পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে অতি গরিব মানুষের সহায়তাদানে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। নিজেকে তিনি দীর্ঘদিন থেকে সৃজনশীল ও গবেষণাধর্মী লেখালেখিতে নিয়োজিত রেখেছেন। কৃষি, শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা, পরিবেশ ও সুশাসনসহ নীতি-নির্ধারণী ও প্রশাসনিক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও নিরন্তর বহুমুখী গবেষণায় সম্পৃক্ত থেকেছেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে ইতোমধ্যে তার বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বই লিখেছেন অর্ধশতাধিক। তার লেখা ৫৬টি বইয়ের মধ্যে ১৮টি লিখেছেন ইংরেজি ভাষায়। বাকিগুলো বাংলায়।

পুরস্কার ও সম্মাননা

জাতীয় : তথ্যপ্রযুক্তিবান্ধব নীতি অনুশীলনের জন্য 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ২০১৫' ইভেন্টে বাংলাদেশ সরকার তাকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট ক্যাটাগরিতে 'জাতীয় আইসিটি পুরস্কার, ২০১৪' প্রদান করে। বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংক খাতের আওতায় আনতে অনবদ্য ভূমিকার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'রেগুলেটর উইথ অ্যা হিউম্যান ফেইস ২০১৪' পুরস্কার পান। এছাড়া বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার জন্য তিনি অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক (২০০৬), চন্দ্রাবতী স্বর্ণপদক (২০০৮), শেলটেক পুরস্কার (২০১০), ▸

নওয়াব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড (২০১২), ধরিত্রী বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড (২০১৫) এবং বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারসহ (২০১৫) অনেক পুরস্কার লাভ করেন।

আন্তর্জাতিক : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক (৮৪টি) অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অতি-দরিদ্রদের অনুকূল কর্মসূচি গ্রহণের জন্য হংকংভিত্তিক ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশন তাকে 'সার্টিফিকেট অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, ২০১২' প্রদান করে। গ্রিন ব্যাংকিংয়ে অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘের 'কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ, ২০১২'-এর প্রতিনিধিরা তাকে 'গ্রিন ব্যাংকার' সাইটেশন প্রদান করেন। পরিবেশ ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নে এবং প্রবৃদ্ধি জোরালো করা ও অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি লন্ডনভিত্তিক 'দ্য ফিন্যান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকার মালিকানাধীন 'দ্য ব্যাংকার' ম্যাগাজিন ঘোষিত 'দ্য বেস্ট সেন্ট্রাল ব্যাংক গভর্নর– এশিয়া প্যাসিফিক, ২০১৫' পুরস্কার লাভ করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির প্রতি গণমানুষের আস্থা গড়ে তোলায় অসমান্তরাল নেতৃত্ব দানের স্বীকৃতি হিসেবে ইউরোমানির সহযোগী সংস্থা 'দ্য ইমার্জিং মার্কেট' থেকেও তিনি 'এশিয়া অঞ্চলের সেরা ব্যাংক গভর্নর, ২০১৫' শীর্ষক পুরস্কার পান। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে অক্লান্ত চেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবে 'গুসি পিস প্রাইজ ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৪' পান। এছাড়া তিনি আরও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন।

ব্যাংকগুলোর ডিজিটালাইজেশন

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকে ব্যাপক ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে ড. আতিউর রহমানের দূরদর্শী নানা পদক্ষেপ বিভিন্ন মহলে সমধিক প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার নেয়া নানা পদক্ষেপ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে আরও জোরালো করেছে। তার এই অবদানের স্বীকৃতি জানিয়েই বাংলাদেশ সরকারের আয়োজিত 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫' ইভেন্টে সরকার তাকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট ক্যাটাগরিতে 'জাতীয় আইসিটি পুরস্কার ২০১৪' প্রদান করে।

উন্নয়নশীল অর্থনীতির যেসব কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের চর্চা করছে, সেসব ব্যাংকের গভর্নরদের মধ্যে তিনি একজন প্রগতিশীল গভর্নর হিসেবে বিবেচিত। বিভিন্ন সৃজনশীল অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকাণ্ডের (ভূমিহীন প্রান্তিক বর্গাচাষীর জন্য ঋণ সুবিধা, সাশ্রয়ী কৃষি ও মোবাইল আর্থিক সেবা, চার্জবিহীন ১০ টাকায় হিসাব খোলা) স্থপতি হিসেবে তিনি সমগ্র আর্থিক খাতকে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়েছেন, যার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত কোটি মানুষের জীবনের উন্নয়ন সাধনের সাথে সাথে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ও এর পরবর্তী সময়ের এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ৬ শতাংশের উপরে বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। তার দূরদর্শী এসব প্রচেষ্টার কারণে মানবিক সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সুপরিচিতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংককে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে তিনি হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন আইসিটিকে। তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্য ব্যাংকগুলোর ডিজিটালাইজেশন অপরিহার্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদে আসীন হওয়ার পর থেকে ড. আতিউরের যাবতীয় পদক্ষেপ পরিচালিত হয়েছে সেই অপরিহার্যতা মেটাতেই। ব্যাংক সেবার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বেশি বেশি হারে সংশ্লিষ্ট করতে তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে সফল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটালাইজেশন

আজকের দুনিয়ায় একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার অপরিহার্য। তথ্যের সহজ প্রাপ্তি উৎপাদনশীলতা

বাড়ায়; নিশ্চিত করে ন্যায্য ও সুষম প্রতিযোগিতার বাজার ব্যবস্থা, যা অন্য উপায়ে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন ঘটায়। সেই সাথে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বাড়ায় দক্ষতা ও স্বচ্ছতা। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছায় তথ্য ও সেবা। এসব উপলব্ধি থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোতে আইটি ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদে আসীন হওয়ার পর থেকেই ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটালাইজেশনের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক খাতকে শৈল্পিক সৌকর্যমণ্ডিত প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করার জন্য একটি কৌশলগত পাঁচসালা পরিকল্পনা (২০১০-১৪) হাতে নেয়। যথাযথ দক্ষ সেবা জোগানোই এর প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বংলাদেশ ব্যাংককে আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন ছিল এর অন্যতম আরেক লক্ষ্য।

এ কথা সত্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকাণ্ড স্বয়ংক্রিয় করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সিবিএসপি (সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট) শুরু হয়েছিল ২০০৩ সালে। তবে বিগত চার বছরেই এই প্রকল্পের বেশিরভাগ কাজ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে রয়েছে দেড় শতাধিক সার্ভার, প্রায় ৪ হাজার পিসি/ল্যাপটপ এবং পর্যাপ্তসংখ্যক প্রিন্টার ও স্ক্যানার। পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ধাপে ধাপে ব্যাংকের প্রত্যেক চাকুরের হাতে পিসির পাশাপাশি ল্যাপটপ তুলে দেয়ার ব্যাপারে। সব এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল করা হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সার্ভার ও অন্যান্য ডিভাইস ব্যবহার করে। সিবিএসপি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। খুব শিগগিরই বাংলাদেশ ব্যাংকে পেপারলেস ব্যাংকিং শুরু হতে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পকে বাংলাদেশের অন্যসব প্রকল্পের চেয়ে সবচেয়ে বেশি সফল প্রকল্প বলে বিবেচনা করছে।

নেটওয়ার্কিং প্যাকেজিংয়ের আওতায় 'স্টেট অব দ্য আর্ট' ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই ডাটা সেন্টার আধুনিক ঝুঁকি মোকাবেলা করতে সক্ষম। যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখে ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক ও শাখাগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগসহ ডিজাস্টার রিকভারি সাইট গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় শাখার সাথে এর দশটি শাখাকে সংযুক্ত করা হয়েছে একটি একক নেটওয়ার্কে।

এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্লানিংয়ের (ইআরপি) 'সিস্টেম, অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড প্রডাক্টস (এসএপি)'-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করছে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে। এর ফলে অ্যাকাউন্টিং প্রসেস, যেমন জেনারেল লেজার অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং, বাজেটিং, অ্যাকাউন্টস পেঅ্যাবল, অ্যাকউন্টস রিসিভ্যাবল, ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট, বাজেট অ্যান্ড কস্ট সেন্টার অ্যাকাউন্টিং, পারচেজ ম্যানেজমেন্ট, ফিক্সড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি এখন যথাযথ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা হচ্ছে। এসএপি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখন নিজেদের ডেস্কে বসে সেলারি স্টেটমেন্ট দেখতে পারছেন।

ব্যাংকটির সার্বিক কর্মকাণ্ড স্বয়ংক্রিয় করার লক্ষ্যে ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরকারের বেশিরভাগ আর্থিক লেনদেন এখন সম্পাদিত হয় ইলেকট্রনিক্যালি। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেয়া হয় ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের (ইএফটি) মাধ্যমে।

এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউস (ইডিডব্লিউ) হচ্ছে একটি অগ্রসর মানের প্রযুক্তিভিত্তিক ডাটা ওয়্যারহাউস। অনলাইনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এটি বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যবহার হয় সেন্ট্রাল ডাটা সেন্টার হিসেবে। এই আধুনিক সফটওয়্যার একটি পরিপূর্ণ ডাটা সেন্টার। আমদানি, রফতানি, প্রবাসী আয়, মূল্যস্ফীতি, ব্যাংক খাতের তথ্য, পরিসংখ্যানগত গবেষণা তথ্য, মুদ্রানীতি, ঋণ সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ম্যাক্রো-ইকোনমিক ডাটা এখানে প্রসেস ও সংরক্ষণ করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট চালু করা হয় ২০০১ সালে। তবে সম্প্রতি হালনাগাদ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এটি নতুন করে ডিজাইন করা হয়। বাড়ানো হয় এর তথ্যসম্ভার। ওয়েবসাইটের বাইরে ডেভেলপ করা হয়েছে ▸

ইন্ট্রানেট, যা বাংলাদেশ ব্যাংকে তথ্য ব্যবস্থাপনার একটি স্ট্রং বেইস। সময় মতো ডাটার পুনর্ব্যবহার ও শেয়ার করার মাধ্যমে এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আর্থিক ও অর্থনৈতিক খাতসংশ্লিষ্ট খবর ইন্ট্রানেট থেকে ডাউনলোড করা যায়। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার ও সঞ্চিতি, মাসিক মূল্যস্ফীতির হার, অনাবাসী বাংলাদেশীদের প্রবাসী আয় এখানে গ্রাফ ও চার্টের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন গাইডলাইন, সার্কুলার, ফরম ইত্যাদি ইন্ট্রানেটে প্রদর্শিত হয়। এর বাইরেও ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে আরও অনেক সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।

মুদ্রা পাচার ও আর্থিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইউনিটে (বিএফআইইউ) বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাসপিসিয়াস ট্র্যানজেকশন রিপোর্ট (এসটিআর) এবং ক্যাশ ট্র্যানজেকশন রিপোর্ট (সিটিআর) সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে। এসটিআর এবং সিটিআরের অনলাইন রিপোর্টিংয়ের জন্য goAML সফটওয়্যার এরই মধ্যে কেনা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে ব্যাংকের বিপুল ডাটা রিপোজিটরিতে প্রবেশ করতে পারে, সেজন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে 'ওপেন ডাটা ইনিশিয়েটিভের'। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ড অটোমেশনের অংশ হিসেবে এই ব্যাংকের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ৮৫টি সফটওয়্যার তৈরি করে এর বিভিন্ন বিভাগে ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাংকের নিজস্ব জনবল দিয়ে এসব সফটওয়্যার মেইনটেইন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রয়কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এরই মধ্যে চালু করেছে ওয়েবভিত্তিক ই-টেন্ডারিং সিস্টেম। ২০১০ সালের ১২ মে এ ব্যবস্থার উদ্বোধন করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্যাংক গড়ায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে ২০০৯ সালের ৩১ মে থেকে ই-প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১২ সালের ১৩ মে উদ্বোধন করে এর ই-লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, যাতে এর ব্যবহারকারীদের ইলেকট্রনিক তথ্যসেবা দেয়া যায়। এতে ৫ হাজার ই-বুক, ২৫ হাজার ই-জার্নাল, তিনটি ই-ম্যাগাজিন ও ৫ হাজার লেখার তথ্য রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক ই-নিউজ ক্লিপিংও শুরু করেছে। দেশের রফতানি কর্মকাণ্ডকে গতিশীল, যথাযথ ও স্বচ্ছ করতে ২০১২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সূচনা করা হয়েছে ইএক্সপি মনিটরিং সিস্টেম। কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর ইএক্সপি ফরম ম্যাচিং সিস্টেম চালু আছে ২০১১ সালের ১ নভেম্বর থেকে। ব্যাংকটিতে চালু আছে ওয়েবভিত্তিক আমদানি-রফতানি অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম। ব্যাংকটি এখন রফতানিসংক্রান্ত আউটফ্লো এক্সপোর্ট রেমিট্যান্স তথ্য অনলাইনে জোগান দেয় ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স সিস্টেমের মাধ্যমে। এর বাইরে বাংলাদেশ ব্যাংক চালু করেছে ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট মনিটরিং সিস্টেম, অ্যাগ্রিকালচার ক্রেডিট মনিটরিং সিস্টেম, প্রাইজবন্ড ও সঞ্চয়পত্র সিস্টেম, মেডিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম, ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ট্রেজারি বিল ও বন্ডের অনলাইন সেকেন্ডারি ট্রেডিং সিস্টেম, অফিসে স্থাপন করা হয়েছে একটি আইটি ল্যাব।

আইটি উন্নয়নের স্বীকৃতি

২০১১ সালে বেসিস আয়োজিত সফটওয়্যার মেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক এর ডিজিটাল কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের জন্য 'ডিজিটাল চ্যাম্পিয়ন' সম্মাননা লাভ করে। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রামে আয়োজিত ডিজিটাল ইনোভেশন ফেয়ারে ব্যাংকটি উচ্চ প্রশংসিত হয়। ২০১১ সালে এই ব্যাংক ই-এশিয়ায় অংশ নিয়ে উচ্চ প্রশংসা কুঁড়ায় এর আধুনিক ব্যাংক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য। আইটি খাতে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যংক নানা ধরনের পুরস্কারে ভূষিত হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশ ব্যাংকের এই দ্রুত ডিজিটালাইজেশনের পেছনে এর গভর্নর ড. আতিউর রহমানের দূরদর্শী ও গতিশীল ভূমিকা অনস্বীকার্য কজ